ওহীর আলো

হযরত আলী

আবুল ফজল

KOBI PROKASHANI

হযরত আলী

আবুল ফজল

প্রকাশকাল

কবি প্রকাশনী প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০২৪

প্রকাশক

সজল আহমেদ

কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট

২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব

লেখক

প্রচ্ছদ

সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস

মোবারক হোসেন

মুদ্রণ

কবি প্রেস

৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক

অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য : ৪৫০ টাকা

Hazrat Ali (Biography of Hazrat Ali in Bengali) by Abul Fazal Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road Katabon Dhaka 1205 Kobi Prokashani First Edition: October 2024

Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)

Price: 450 Taka RS: 450 US 25 $

E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-98948-7-2

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন

www.kobibd.com or www.kanamachhi.com

অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১

www.rokomari.com/kobipublisher

অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

লেখকের নিবেদন

কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড খুলাফায়ে রাশেদিনের জীবনকাহিনি প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এ যে এক মহৎ দায়িত্ব এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। আর বাংলা সাহিত্যে এর প্রয়োজনও অনস্বীকার্য।

বোর্ডের পরিচালকমণ্ডলী দয়া করে আমার ওপর ভার দিয়েছেন চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা.)-এর জীবনকথা রচনার। এ সম্পর্কে আমার জ্ঞান আর যোগ্যতা অত্যন্ত সীমিত—ছাত্রাবস্থায় যাকে ইসলামিক স্টাডিজ বলা হয়, তা আমি কিছুটা পড়েছিলাম। তবে সে অধ্যয়নও তেমন গভীর আর ব্যাপক ছিল না। এ দায়িত্ব গ্রহণের আহ্বানের মধ্যে আমি আমার যে সীমিত অধ্যয়ন আর অপরিণত জ্ঞানকে আর একটু ঝালিয়ে নেওয়ার সুযোগ দেখতে পেলাম, তাই নিজের অযোগ্যতা সম্বন্ধে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল থেকেও আমি এ দায়িত্ব গ্রহণে এগিয়ে এসেছি। এ দায়িত্ব পালনে ত্রুটি-বিচ্যুতি যে ঘটেনি তা নয়—বিশেষত যে যুগের ইতিহাস এখানে বর্ণিত হয়েছে তার উপকরণ আজও বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন রয়ে গেছে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সুশৃঙ্খলভাবে সংগৃহীত ও লিপিবদ্ধ হয়নি সেসব আজও। তাই সংগ্রহ করতে হয়েছে নানা বই থেকে নানা উপকরণ, অনেক ক্ষেত্রে নির্ভর করতে হয়েছে ইউরোপীয় গবেষকদের ওপর। তবে মুশকিল এই যে, সব ক্ষেত্রে এঁদের নিরপেক্ষতাকে মেনে নেওয়া যায় না। মুসলমান ঐতিহাসিকদের মধ্যেও রয়েছে শিয়া-সুন্নীর প্রভেদ, ফলে অনেক ক্ষেত্রে প্রকাশ পেয়েছে পরস্পরবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি; বিশেষ করে হযরত আলীর ব্যাপারে। আমি এসব মতভেদের মধ্যে প্রবেশ করিনি। এ জাতীয় গ্রন্থের জন্য ঐসবকে মনে করেছি অনাবশ্যক।

উন্নয়ন বোর্ডের লক্ষ্য একটি সুখপাঠ্য তথা পপুলার সিরিজ প্রকাশ করা—উপদলীয় কোন্দল বা বাদানুবাদকে তাতে স্থান দিতে গেলে এ উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে। তাই শিয়া-সুন্নীর ঝগড়া এ গ্রন্থে আমল পায়নি। খুলাফায়ে রাশেদিন অর্থাৎ প্রথম চার খলিফাই খাঁটি আর ন্যায়বান খলিফা ছিলেন—আমার বিশ্বাস এ দৃষ্টিভঙ্গিতেই উন্নয়ন বোর্ডের এ সিরিজের বইগুলো লেখা হয়েছে ও হচ্ছে। আমারও এ দৃষ্টিভঙ্গি—এ দৃষ্টিভঙ্গিতেই লেখা হয়েছে হযরত আলী।

বইটিকে আমি পাঁচ খণ্ডে ভাগ করেছি, খণ্ডগুলোকে নাম দিয়েছি যথাক্রম—১. খিলাফতের আগে, ২. খিলাফত থেকে শাহাদাত, ৩. চরিত্র আর শাসনব্যবস্থা, ৪. ধর্মবোধ ও জীবনদর্শন, আর ৫. বাণী-সংকলন।

আমি বিশেষভাবে জোর দিয়েছি পঞ্চম খণ্ডের ওপর, তাই এ খণ্ড হয়েছে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ। হযরত আলীর জীবন আর খিলাফতকাল কেটেছে এক অস্বাভাবিক দুর্যোগের মধ্যে। তিনি অসাধারণ বীর আর ন্যায়পরায়ণ খলিফা ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। তবুও আমার বিশ্বাস, জ্ঞান-সাধকের ভূমিকা ছিল তাঁর সবার ওপরে। তাঁর সমকক্ষ জ্ঞান-সাধক সে যুগে শুধু আরব দেশে কেন, অন্যত্রও ছিল কি না সন্দেহ। তিনি তাঁর জ্ঞান-গর্ভ বাণীর যে উত্তরাধিকার রেখে গেছেন মানুষের জন্য তার থেকে উত্তম উত্তরাধিকার কল্পনা করা যায় না। বাংলা ভাষাভাষীরাও যাতে এ অমূল্য উত্তরাধিকারকে নিজের জীবন আর মনমানসের পাথেয় করে নিতে পারে এ উদ্দেশ্যে আমি এসবের ওপরই গুরুত্ব দিয়েছি বেশি। আমার এও বিশ্বাস, সত্যিকার হযরত আলীকে খুঁজে পাওয়া যাবে তাঁর জ্ঞান-সাধনা আর ভাব-গভীর কথামতে। পৃথিবীর তাবৎ সভ্য ভাষায় এগুলো অনূদিত হওয়ার কারণও এটি। তাঁর জীবনের এ দিকটার উপকরণের জন্য আমি বিশেষভাবে নির্ভর করেছি 'নহজুল বলাগা' নামক গ্রন্থের ওপর। জে. এ. চ্যপমেনের Maxims of Ali গ্রন্থটিরও নিয়েছি দরাজ সহায়তা।

হযরত আলীর জীবন আর যুগের পরিচয় নিতে আমাকে অনেক গ্রন্থের আশ্রয় নিতে হয়েছে। সেসব গ্রন্থের একটি তালিকা 'প্রমাণপঞ্জি' নামে পরিশিষ্টে দেওয়া হলো। এ তালিকার বাইরেও সাহায্য নিতে হয়েছে কিছু কিছু রেফারেন্স বইয়ের, যেমন—Encyclopedia of Islam, Encyclopedia of Britannica ইত্যাদির।

হযরত রসুলে করিমের নামের শেষে দরুদ আর খলিফা ও সাহাবাগণের নামের শেষে 'রাজি আল্লাহ' লেখা সম্পর্কে এ সিরিজের প্রথম গ্রন্থ 'হযরত আবুবকর' প্রণেতা মরহুম কবি গোলাম মোস্তফা যে নীতির অনুসরণ করেছেন—এ গ্রন্থেও সে নীতিই অনুসৃত হয়েছে।

জুলাই, ১৯৬৭ **আবুল ফজল**

সূচিপত্র

প্রস্তাবনা ৯

প্রথম খণ্ড : খিলাফতের আগে

প্রথম অধ্যায় : জন্ম ও শৈশব ১৫

দ্বিতীয় অধ্যায় : ইসলাম গ্রহণ ১৯

তৃতীয় অধ্যায় : হিজরত ২৩

চতুর্থ অধ্যায় : জঙ্গে বদর ও হযরত ফাতিমার সঙ্গে শাদি ২৭

পঞ্চম অধ্যায় : অন্যান্য যুদ্ধে হযরত আলীর ভূমিকা ৩৫

ষষ্ঠ অধ্যায় : খলিফা নির্বাচিত হওয়ার আগের অবস্থা ৪৬

দ্বিতীয় খণ্ড : খিলাফত থেকে শাহাদাত

সপ্তম অধ্যায় : খলিফা পদে হযরত আলী ৫৩

অষ্টম অধ্যায় : খিলাফতের প্রথম বছর ৫৮

নবম অধ্যায় : উষ্ট্রের যুদ্ধ ৬৩

দশম অধ্যায় : সিফ্‌ফিনের যুদ্ধ ৭৪

একাদশ অধ্যায় : খারিজিদের সঙ্গে সংঘর্ষ ৮৯

দ্বাদশ অধ্যায় : মিসর খলিফার হাতছাড়া ৯৬

ত্রয়োদশ অধ্যায় : অশান্তি আর অরাজকতা ১০০

চতুর্দশ অধ্যায় : শাহাদাত ১০৬

তৃতীয় খণ্ড : চরিত্র আর শাসনব্যবস্থা

পঞ্চদশ অধ্যায় : হযরত আলীর চরিত্র (ক) ১১৩

ষোড়শ অধ্যায় : হযরত আলীর চরিত্র (খ) ১২০

সপ্তদশ অধ্যায় : হযরত আলীর শাসনব্যবস্থা ১২৬

চতুর্থ খণ্ড : ধর্মবোধ ও জীবনদর্শন

অষ্টাদশ অধ্যায় : হযরত আলীর কয়েকটি খুতবা ১৩৯

ঊনবিংশ অধ্যায় : হযরত আলীর চিঠিপত্র, নসিহত ও নির্দেশাবলি ১৫১

পঞ্চম খণ্ড : বাণী-সংকলন

বিংশ অধ্যায় : হযরত আলীর বাণী-সংকলন ১৭১

একবিংশ অধ্যায় : হযরত আলীর উপস্থিত বুদ্ধি ও ন্যায়বিচার ২০৫

প্রমাণপঞ্জি ২০৮

প্রস্তাবনা

ইসলামের মহান নবী রসুলে করিম ইন্তেকাল করেন ৬৩২ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে—১১ হিজরির ১২ রবিউল আওয়াল, রোজ সোমবার।[১] এ অপ্রত্যাশিত দুঃসংবাদ দাবানলের মতো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ার পর নব-প্রতিষ্ঠিত মুসলিম সমাজে নেমে এলো দারুণ শোকের এক কালো ছায়া। বিশেষ করে মদিনাবাসীরা এক মর্মান্তিক বেদনায় হয়ে পড়ল অভিভূত, দিশেহারা ও কিংকর্তব্যবিমূঢ়, কেউ কেউ শোকের প্রচণ্ড আঘাতে প্রায় অর্ধ-উন্মাদ। কারও কারও কাছে খবরটা স্রেফ অবিশ্বাস্য বলেই মনে হলো।

হযরতের চিরছায়া-সঙ্গী, সংযত-চিত্ত ও চির-প্রাজ্ঞ হযরত আবু বকর—যিনি ইসলামের সব শিক্ষা ও সৌন্দর্যকে মনে-প্রাণে আত্মসাৎ করে আল্লাহ্, আল্লাহ্র ধর্মে আর আল্লাহ্র নবীতে ছিলেন উৎসর্গিত-প্রাণ—এ দুঃসময়ে একমাত্র তিনিই রইলেন স্থির, শান্ত ও হিমাদ্রির মতো অচল, অটল। চারদিকের শোকের মাতম ও আহাজারিকে উপেক্ষা করে সর্বাগ্রে তিনিই মেনে নিলেন আল্লাহ্র অমোঘ বিধান—কায়মনোবাক্যে নিজেকে সঁপে দিলেন আল্লাহ্র হুকুমের তাঁবেদারিতে।

প্রাণঢালা ভক্তির শেষ অর্ঘ্য আল্লাহ্র রসুলের চির-পবিত্র কপালে এঁকে দিয়ে এবার তিনি উদাত্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'তুমি জীবনে যেমন ছিলে মধুর, মৃত্যুতেও তেমনি মধুর।'

তারপর শোকান্মত্ত হযরত ওমরের দিকে তাকিয়ে, সারা মুসলিমজগৎকে শুনিয়েই তিনি যেন বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করলেন : 'যারা মুহম্মদকে পূজা করত তারা জেনে রাখো, মুহম্মদের মৃত্যু হয়েছে। আর যারা আল্লাহ্র পূজা বা ইবাদত করত তারা জেনে রাখো, আল্লাহ্ বেঁচে আছেন, আল্লাহ্র মৃত্যু নেই।' ভক্তি, বিশ্বাস ও ঐশী-প্রেমের এমন অভিব্যক্তি সত্যই দুর্লভ।

হযরত আবু বকরের মুখে এ বিদ্যুৎ-গর্ব বাণী শোনামাত্রই হযরত ওমরের সর্ব অবয়ব থরথর করে কেঁপে উঠল। পরে তিনি নিজেই বলেছেন : 'হযরত আবু বকরের মুখ-নিঃসৃত কথাগুলো শোনার পর আমার সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গে কল্পনা শুরু হয়ে গেল—এবার নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারলাম রসুলুল্লাহ্ ইন্তেকাল করেছেন।'

আল্লাহ্র রসুল আল্লাহ্র যে বাণী ও আল্লাহ্র যে পাক-কালাম মানবজাতির জন্য রেখে গেছেন এতকাল হযরত ওমর যেন তার নিগূঢ় অর্থ বুঝতে পারেননি—

---

১ এ তারিখ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে কিছুটা মতভেদ আছে। আমরা সর্বাধিক স্বীকৃত মতই গ্রহণ করেছি।—লেখক

আজ তা বুঝতে পেরে আল্লাহ্‌র অমোঘ-বিধানের কাছে তিনিও এবার মাথা নত করলেন, করলেন সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ।

ওফাতের সময় মুসলমানের জন্য আল্লাহ্‌র নবী রেখে গেছেন দুটি মূল্যবান মিরাস—একটি ইসলাম, অন্যটি মুসলিম রাষ্ট্র; একটির জন্য দ্বীনি ইলম, অন্যটির জন্য সিয়াসতী যোগ্যতা অত্যাবশ্যক। এ দুটির রক্ষণাবেক্ষণ, প্রচার ও শাসনের জন্য চাই হযরতের স্থলাভিষিক্ত তথা খলিফা। কোরআন-হাদিসের বিধান ও নির্দেশমতো এ দুই দায়িত্ব পালন করতে হবে খলিফাকে। তাই যথাযথভাবে এ দুই দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত যোগ্যতা আর তালিম থাকা চাই যিনি খলিফা হবেন তাঁর।

ইসলামের প্রথম চার খলিফা অর্থাৎ হযরত আবু বকর, হযরত ওমর, হযরত ওসমান ও হযরত আলী এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; অর্থাৎ ইসলাম ও ইসলামের বিধানকে জারি আর ইসলামি রাষ্ট্রকে শাসন করার পুরোপুরি যোগ্যতা ও শিক্ষা তাঁদের ছিল, আর তাঁরা সেভাবেই পালন করে গেছেন তাঁদের স্ব স্ব কর্তব্য ও দায়িত্ব। এ জন্যই সম্মিলিতভাবে তাঁদের ইসলামি পরিভাষায় 'খুলাফায়ে রাশেদিন' বলা হয়। তাঁদের খিলাফত সত্য, ন্যায় ও পুণ্যের পথেই পরিচালিত ছিল, আর তাঁরা নিজেরাও ছিলেন ওই পথের পথিক আর ঐসব গুণে গুণান্বিত—তাই এ নাম।

হযরত ওমরের খিলাফতের শেষ দিক থেকে, বিশেষ করে হযরত ওসমান ও হযরত আলীর সময় যে গোলমাল, ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল, তার জন্য তাঁরা অর্থাৎ স্বয়ং খলিফারা প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে দায়ী ছিলেন না। নানা বংশ ও গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্ব, হিংসা-বিদ্বেষ আর ক্ষমতা ও স্বার্থ নিয়ে যে অসন্তোষ তলে তলে ধূমায়িত হচ্ছিল ঐসব তারই বহিঃপ্রকাশ। তাঁরা ব্যক্তিগত স্বার্থে খিলাফত তথা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে প্রয়োগ করেননি, দখলও করেননি সেভাবে ও সে উদ্দেশ্যে। তাঁরা নিজরা কুচক্রী ও ক্ষমতালোভী ছিলেন না। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার জন্য, এমনকি নিজেদের আত্মরক্ষার জন্যও তাঁরা অতি সাধারণ মামুলি ব্যবস্থাও গ্রহণ করেননি—রাখেননি নিজেদের কোনোরকম দেহরক্ষী কি দ্বাররক্ষক পর্যন্ত। ফলে, শেষ তিন খলিফাকে আততায়ীদের হাতেই শাহাদাত বরণ করতে হয়েছে।

প্রথম খলিফা হযরত আবু বকরের খিলাফত ছিল স্বল্পায়ু—মাত্র দুবছর তিন মাস (৬৩২-৬৩৪ খ্রি., ১১-১৩ হি.)। হযরত রসুলে করিমের ওফাতের সঙ্গে সঙ্গেই কয়েকজন কপট ও ভণ্ড নবীর আবির্ভাব ঘটেছিল; হযরত আবু বকর এসব ভণ্ড নবীকে দমন করে ইসলামের চিরন্তন রূপ অর্থাৎ রসুলুল্লাহ্‌র নবুয়তকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর খিলাফতকালের এ একটি মহত্তম অবদান।

দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমরের খিলাফতকাল ছিল মোটামুটি সাড়ে দশ বছর (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি., ১৩-২৩ হি.)। হযরত আবু বকরের তুলনায় তিনি ইসলাম ও মুসলিম রাষ্ট্রের খেদমত করার সময় ও সুযোগ পেয়েছিলেন অনেক বেশি। ফলে তাঁর সময় ইসলাম ও ইসলামি সাম্রাজ্য দূর-দূরান্তেও ছড়িয়ে পড়েছিল, হয়েছিল দিগ্‌দিগন্তে প্রসারিত। তাঁর খিলাফতকালেই বিজিত হয়েছিল পারস্য, সিরিয়া, মিসর

আর বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের অনেকখানি। এভাবে ইসলামি সাম্রাজ্যের বিস্তার আর প্রতিষ্ঠা তাঁর সময়েই ঘটে। এ কারণে হযরত ওমরের খিলাফতকাল স্মরণীয় হয়ে আছে ইসলামের ইতিহাসে।

হযরত ওমরের পর হযরত ওসমান খলিফা নির্বাচিত হন। তাঁর খিলাফতকাল মোটামুটি বারো বছর স্থায়ী ছিল (৬৪৫-৬৫৬ খ্রি., ২৩-৩৫-৩৬ হি.)। তাঁর সময়েই প্রকাশ্যে মাথাচারা দিয়ে ওঠে নানা অভিযোগ আর ব্যাপক একটা বিদ্রোহ-প্রবণতা। বিভিন্ন শুরা বা প্রদেশগুলোতে দেখা দেয় বিচ্ছিন্নতার মনোভাব আর বিক্ষোভ। যার চরম পরিণতি ঘটে তাঁর শাহাদাতে।

হযরত ওসমানের সময় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ও ছড়িয়ে থাকা ওহিগুলোকে অর্থাৎ কোরআন শরিফের আয়াতসমূহকে সর্বপ্রথম সংগৃহীত, সংকলিত ও একত্রে গ্রথিত করা হয়। এটি ইসলামের এক বড় খেদমত আর তাঁর খিলাফতকালের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কীর্তি।

হযরত ওসমানের স্থলাভিষিক্ত হন হযরত আলী। তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান অত্যন্ত নির্মমভাবে নিহত হওয়ার ছদিন পরে, কিছুটা ইতস্তত করার পর, অনেকটা যেন বাধ্য হয়েই তিনি গ্রহণ করেন খলিফার সম্মানিত পদ ও আসন। তাঁর খিলাফতকাল স্থায়ী হয়েছিল মাত্র চার বছর ন'মাস (৬৫৬-৬৬১ খ্রি., ৩৬-৪০ হি.)।

হযরত ওসমানের হত্যাকারীদের বিচার ও দণ্ড-বিধানের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে তাঁর খিলাফতের সূচনা থেকে যে অশান্তি বিক্ষোভ ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল, তার হাত থেকে তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত রেহাই পাননি। হযরত আলী মনে-প্রাণে শান্তিপ্রিয় ও শান্ত-স্বভাবের হওয়া সত্ত্বেও শান্তি তিনি পাননি তাঁর সারা খিলাফতকালব্যাপী। পূর্ববর্তী দুই খলিফার মতো তাঁকেও আততায়ীর হাতেই শাহাদাতবরণ করতে হয়েছে।

খুলাফায়ে রাশেদিন গ্রন্থমালার এ খণ্ডে আমরা চতুর্থ খলিফা হযরত আলীর জীবন ও শাসনকালের ইতিহাসের সন্ধান করব—চেষ্টা করব তাঁর মহৎজীবনের একটি ইতিহাসসম্মত সঠিক পরিচয় পাঠকদের সামনে পেশ করতে।

এ গ্রন্থ রচনায় যেসব আরবি, উর্দু, ইংরেজি ও বাংলা বই-পুস্তকের সহায়তা নিয়েছি তার একটা ফিরিস্তি গ্রন্থ-শেষে দেওয়া হলো। এ কথা ভূমিকায়ও উল্লিখিত হয়েছে।

✦ 'ধর্ম একটা বৃক্ষের মতো, যার শিকড়
বিশ্বাস, শাখা আল্লাহ্‌র ভয়, ফুল নম্রতা আর
ফল হৃদয়ের ঔদার্য।'

—হযরত আলী

✦ 'মানুষের উপকার করেই জাতিকে শাসন
করা যায়।'

—হযরত আলী

প্রথম খণ্ড

খিলাফতের আগে

প্রথম অধ্যায়

জন্ম ও শৈশব

হযরত রসুলে করিমের আবির্ভাবকালে সম্মান, প্রতিপত্তি ও শরাফতিতে আরব দেশে কোরায়েশ বংশের তুলনা ছিল না। অধিকন্তু কাবার রক্ষক হিসেবে এ বংশ ছিল অধিকতর ইজ্জতের অধিকারী। এ বংশেরই সেরা শাখার নাম হাশেমি। এ বংশেই ইসলামের মহানবী হযরত মুহম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের জন্ম। হযরত আলীরও জন্ম এ বংশে—মা ও বাপ এ উভয় দিক থেকেই তিনি হাশেমি। তাঁর পিতার আসল নাম আবদুল মুনাফ। আরব দেশের প্রথানুসারে জ্যেষ্ঠপুত্র তালিবের নামের সঙ্গে যুক্ত করে তাকে ডাকা হতো আবু তালিব অর্থাৎ তালিবের বাপ। এ নামেই তিনি পরিচিত ছিলেন, ইতিহাসেও উল্লিখিত হয়েছেন এ নামেই। পরবর্তী জীবনে হযরত আলীকেও তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র ইমাম হাসানের নামের সঙ্গে মিলিয়ে আবুল হাসান বলা হতো। বলা বাহুল্য, আরব দেশে ব্যক্তি বিশেষকে এভাবে ডাকা এক বহুল প্রচলিত ও সর্বস্বীকৃত রেওয়াজ ছিল সেকালে।

রসুলে করিমের পিতা আবদুল্লাহ্ আর হযরত আলীর পিতা আবু তালিব পরস্পর ভাই। কাজেই সম্বন্ধের দিক দিয়ে আবু তালিব ছিলেন রসুলে করিমের হাকিকী অর্থাৎ আপন চাচা আর আলী আপন চাচাতো ভাই। আবার মায়ের দিকে থেকে ছিলেন ফুফাতো ভাই।

একই বংশোদ্ভূত বলে খুলাফায়ে রাশেদিন সবাই পরস্পরের সঙ্গে শুধু নয়, রসুলে করিমের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ রক্তসম্পর্কে তথা বংশগত আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। তবে হযরত আলীর সঙ্গে যে আত্মীয়তা তা ছিল নিকটতম। পরে রসুলে করিমের প্রিয়তমা কন্যা খাতুনে জান্নাত বিবি ফাতিমাকে শাদি করার পর তিনি হয়ে পড়েন রসুলের আরও প্রিয়পাত্র ও অন্তরঙ্গ।

হযরত আলীর মায়ের নাম ফাতিমা বিনতে আসাদ ইবনে হাশিম। হযরত রসুলে করিমের পিতামহ আবদুল মুত্তালিব আর হযরত আলীর নানাজান আসদ পরস্পর ভাই ছিলেন।

কথিত আছে, হযরত আলীর জন্ম কাবাগৃহের অভ্যন্তরেই হয়েছিল। তাঁর মা ফাতিমা পূর্ণ-গর্ভাবস্থায় যখন একদিন কাবার তওয়াফ করছিলেন, তখন তিনি হঠাৎ প্রবল গর্ভ-বেদনা অনুভব করেন। ঘটনাক্রমে সে সময় হযরত রসুলে করিমও

সেখানে উপস্থিত। ফাতিমার যন্ত্রণা দেখে হযরত নিকটে এসে কারণ জিজ্ঞাসা করতেই ফাতিমা নিজের অবস্থার কথা হযরতকে জানালেন। তখন হযরত বললেন : ‘কাবার ভিতর চলে যাও, সেখানে নিজের বোঝা তুমি হালকা করতে পারবে।’ হযরতের কথামতো ফাতিমা ভিতরে প্রবেশ করার অল্পক্ষণের মধ্যেই নেহাত আসানিয়তের সাথে তাঁর প্রসবকর্ম সাধিত হয়। এ প্রসবেরই ফল হযরত আলী। কোনো কোনো জীবনীকার ও ঐতিহাসিক বলেছেন : এ বর্ণনা সত্য নয়, হযরত আলীর জন্ম ঠিক কাবাগৃহের অভ্যন্তরে হয়নি। কাবার চারদিকে ছিল তখন হাশেমিয়া মহল্লা। কাবার রক্ষক ও নেগাবান হিসেবে হাশেম বংশীয়রা প্রধানত কাবার নিকটবর্তী মহল্লাগুলোতেই বসবাস করতেন। সেখানে কাবার নিকটবর্তী কোনো এক গৃহের হুজরায় হযরতা আলী জন্মগ্রহণ করেন। অধিকাংশ ঐতিহাসিক এ মতই সমর্থন করেন।

যাই হোক, এ কথা ঠিক যে, কাবাগৃহের অভ্যন্তরে না হলেও হযরত আলী মক্কা মুয়াজ্জমায়, পবিত্র কাবাগৃহের নিকটবর্তী কোথাও জন্মগ্রহণ করেছেন।

তাঁর জন্মের সন-তারিখ নিয়েও কিছু মতভেদ আছে। মতভেদ ঘটার বড় কারণ তখন আরব দেশে সন-তারিখ হিসাব করার তেমন সুনির্দিষ্ট কোনো পন্থা বা ব্যবস্থা ছিল না। হিজরি সন গণনার রেওয়াজ গৃহীত হয় হযরত ওমরের আমলে এবং ইসলামের ইতিহাস হযরত আলীর কাছে এ জন্যই ঋণী। কারণ তাঁর পরামর্শেই হযরত ওমর হিজরতের দিন থেকে মুসলিমবর্ষ তথা হিজরি সন গণনা শুরু করেন, যা আজ পৃথিবীব্যাপী পেয়েছে স্বীকৃতি।

হস্তীযূথ নিয়ে খ্রিস্টান সৈন্যাধ্যক্ষ আব্রাহার কাবা আক্রমণ আরব দেশের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। যার উল্লেখ কোরআন শরিফের সুরা ফিলেও করা হয়েছে। এ আক্রমণের ফলে ওই বছরটাও আরবদের কাছে এক উল্লেখযোগ্য ও স্মরণীয় বছর হয়ে আছে। আব্রাহার আক্রমণের ত্রিশ বছর পরে আর আমাদের রসুলে করিমের নবুয়ত প্রাপ্তির দশ বছর আগে হযরত আলী জন্মগ্রহণ করেন। অধিকাংশ জীবনীকারের এই সিদ্ধান্ত।

জননী ফাতিমা নিজের পিতার নামানুসারে প্রথমে নাকি পুত্রের নাম রাখেন আসদ। আসদ মানে সিংহ। সিংহের অন্য একটি আরবি প্রতিশব্দ ‘হায়দর’। হযরত আলী অমিত বিক্রমশালী ছিলেন। পরবর্তী জীবনে তিনি বহুবার অসাধারণ সাহস ও অপূর্ব বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এ কারণেও পরে তাঁর নামের সঙ্গে ‘হায়দর’ শব্দটি যুক্ত হয়ে পড়ে। ‘আলী হায়দর’ কথাটা আজ বহুল প্রচলিত। আসদ নামটি কিন্তু তাঁর পিতা আবু তালিবের তেমন পছন্দ হয়নি। তাই পালটে তিনি পুত্রের নাম রাখলেন ‘আলী’—মানে ‘সমুন্নত’। এটি সুন্দর, সংক্ষিপ্ত ও অর্থপূর্ণ—তাই সকলের পছন্দ হলো। এ থেকে এ নামেই তিনি পরিচিত হয়ে ওঠেন। একবার ঠাট্টাচ্ছলে রসুলে করিম প্রিয় জামাতাকে ‘আবু তুরাব’ বলেও সম্বোধন করেছিলেন। সে থেকে কেউ কেউ তাঁকে আবু তুরাব বলেও ডাকত।

একদা রসুলে করিম কন্যা-জামাতাকে দেখতে ওদের ঘরে এসে দেখেন আলী অনুপস্থিত। মেয়েকে জিজ্ঞাসা করতেই মেয়ে মুখ ভার করে বললেন : 'এ মাত্র আমার সঙ্গে ঝগড়া করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছেন।'

শুনে হযরত তখনই জামাতার সন্ধানে বের হলেন। বেশি দূর যেতে হলো না—দেখতে পেলেন নিকটে এক পাঁচিলের ছায়ায় হযরত আলী মাটিতে শুয়ে ঘুমিয়ে আছেন। তখন হযরত পরিহাসের সুরে ডাক দিলেন—'হে আবু তুরাব।' বলা বাহুল্য, তুরাব মানে মাটি আর আবু মানে তো বাপ, অর্থাৎ হে মাটির বাপ। এ থেকেই হযরত আলীর এ নামের উৎপত্তি।

হযরত রসুলে করিমের জীবনী আর ইতিহাস পাঠকদের অজানা নয়—হযরতের জন্মের আগেই হযরতের পিতা আবদুল্লাহ্‌র মৃত্যু ঘটে। তাই শিশু হযরত মুহম্মদ (দ.) প্রথমে পিতামহ আবদুল মুত্তালিব কর্তৃক লালিত-পালিত হন। আবদুল মুত্তালিবের মৃত্যুর পর চাচা আবু তালিব তাঁর লালন-পালনের ভার গ্রহণ করেন। হযরতের শৈশব-কৈশোর এমনকি গোটা প্রথম জীবন চাচা আবু তালিবের গৃহে, তাঁরই স্নেহছায়ায় অতিবাহিত হয়। বিবি খাদিজার সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পর রসুলে করিমের সংসারে আর কোনো অভাব ছিল না। সুখে-স্বচ্ছন্দে আর আল্লাহ্‌র ধ্যানে এবার তিনি সময় কাটাতে লাগলেন।

এ সময় অজন্মার ফলে আরব দেশে নেমে এলো এক ভীষণ দুর্ভিক্ষ। সচ্ছল ধনীগৃহ ছাড়া সর্বত্রই দেখা দিল অভাব—ঘরে ঘরে শুরু হলো ক্ষুধার্তের হাহাকার। আবু তালিবের সংসার বড়—ছেলেমেয়ের সংখ্যাও অনেক। ফলে তিনিও পড়লেন অশেষ দুঃখ-কষ্টে। রসুলে করিম এ দৃশ্য দেখে আর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি অন্যতম চাচা আব্বাসকে সঙ্গে নিয়ে আবু তালিবের কাছে গিয়ে হাজির হলেন। তাঁরা দুজনে তাঁর দুটি ছেলের ভরণপোষণ ও লালন-পালনের ভার নিতে চান জানালেন এ আরজ। দুর্ভিক্ষের দিন বৃদ্ধ আবু তালিব সহজেই রাজি হলেন। নিজেদের পছন্দমতো এবার হয়তো আব্বাস তৃতীয় পুত্র জাফর তয়্যিব আর রসুলে করিম চতুর্থ পুত্র আলীর ভার গ্রহণ করে নিজ নিজ গৃহে নিয়ে এলেন তাঁদের। এ সময় হযরত আলীর বয়স ছিল মাত্র পাঁচ বছর। এ থেকে তিনি হযরত রসুলে করিমের কাছে—তাঁর সহবত ও সান্নিধ্যে থেকে, তাঁর শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠার এক দুর্লভ সৌভাগ্য লাভ করেন। হযরত তাঁকে নিজের আপন সন্তানের মতোই পরমস্নেহ ও আদরে বড় করে তুলতে লাগলেন। হযরতের মতো মহিয়সী বিবি খাদিজাও আলীকে আপন পুত্রের মতো ভালোবাসতেন। বিশ্বের দুজন শ্রেষ্ঠতম নর-নারীর সান্নিধ্যে এভাবে তাঁর শৈশবকাল পরম সুখে ও আনন্দে অতিবাহিত হয়েছে। পরিণত বয়সে তাঁর স্বভাব-চরিত্র ও ব্যবহারে যে অসাধারণ সৌন্দর্য ও মাধুর্য প্রকাশ পেত, মনে হয় তা এ দুই মহৎ চরিত্রের প্রভাবেরই ফল। তিনি অত্যন্ত বলিষ্ঠদেহ ও অসীম সাহসী ছিলেন; কিন্তু কিছু মাত্র উগ্র ছিলেন না। ধৈর্য হারাতেন না কোনো

অবস্থাতেই, ছিলেন সবসময় শান্ত ও সংযত-চিত্ত। এমনকি মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েও এতটুকু বিচলিত হননি তিনি। শৈশবে তাঁর পেট কিছুটা মোটা ছিল। এ নিয়ে সমবয়সীরা তাঁকে যথেষ্ট হাসি-ঠাট্টা করত। তাতে তিনি মোটেও চটতেন না। বরং ওদের হাসি-পরিহাস যেন নিজেও উপভোগ করতেন। আবু সঈদ তমীমী বলেছেন : 'আমরা তাঁকে পেট মোটা বলে উপহাস করলে তিনি মোটেও রেগে যেতেন না, উলটো পরিহাস করে বলতেন : হ্যাঁ, পেটটি আমার কিছুটা মোটা বটে, তবে তা বেশি খাওয়ার ফল নয়, তাতে অনেক বিদ্যা-বুদ্ধি আর ইলম জমা আছে বলেই ওটা এমন মোটা দেখাচ্ছে।'

আরব দেশের সে যুগে প্রথানুসারে বালক আলীকেও কুস্তি, মল্লযুদ্ধ অশ্ব-চালনা আর অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। তিনি দৈহিক বলে এতখানি বলীয়ান ছিলেন যে, তাঁর বয়সের খেলার সাথীরা কেউই শারীরিক শক্তিতে তাঁর সঙ্গে এঁটে উঠতে পারত না।

ইসলামের সূচনার যুগের শত্রুর সঙ্গে বহুবার বহুক্ষেত্রে মোকাবিলা করে ইসলাম আর ইসলামের রসুলকে আত্মরক্ষা করতে হয়েছে। লিপ্ত হতে হয়েছে আত্মরক্ষামূলক বহুতর যুদ্ধবিগ্রহে। এসব যুদ্ধক্ষেত্রে ইসলাম ও হযরত রসুলে করিমের এক বড় সহায় ছিলেন শেরে-খোদা হযরত আলী। শৌর্যবীর্য, সাহস ও বিক্রমের জন্য তিনি যৌবনকালেই এ নামে পরিচিত হয়েছিলেন।

পরবর্তী জীবনে হযরত আলী যে একাধারে ধার্মিক, জ্ঞানী, তাপস ও বীরের ভূমিকা পালন করে গেছেন; যার জন্য তিনি শুধু ইসলামের নয়, বিশ্বের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন, তার গোড়াপত্তন হযরত রসুলে করিমের স্বগৃহে, তাঁর সান্নিধ্যে ও তাঁর আদর্শেই হয়েছিল। একই চরিত্রে ভক্তির এমন কমনীয় সুষমা আর দুর্বার বিক্রমের এমন সূর্য-প্রখর দীপ্তি কদাচিৎ দেখা যায়।

আর হযরত আলীর অসীম জ্ঞান সম্বন্ধে স্বয়ং আল্লাহ্‌র রসুলই তো স্বীকৃতি জানিয়ে গেছেন : 'আমি জ্ঞানের নগর আর আলী তার দরজা।'

এর চেয়ে বড় প্রশস্তি মানুষের জন্য আর কী হতে পারে?

✦ 'যে জগৎ তোমাকে দেয় ঘৃণ্য বা পাপময় আনন্দ,
তা সর্পের মতো—স্পর্শ তার কোমল বটে; কিন্তু
মারাত্মক বিষে ভরা। নির্বোধেরা তার প্রতি প্রলুব্ধ
হয় আর আকৃষ্ট হয় তার দিকে; কিন্তু বিজ্ঞ ব্যক্তি
তাকে পরিহার করে চলে, এবং তার বিষাক্ত
প্রভাব থেকে থাকে দূরে।'

—হযরত আলী

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলাম গ্রহণ

হযরত রসুলে করিমের নবুয়ত প্রাপ্তির সময় হযরত আলীর বয়স ছিল মাত্র দশ বছর (কারও কারও মতে আট)। রসুলের আহ্বানে তথা ইসলামের দাওয়াতে কে সর্বাগ্রে সাড়া দিয়ে ইমান এনে মুসলমান হয়েছিলেন, সে সম্পর্কে কিছুটা মতভেদ আছে। বিবি খাদিজা যে প্রথম মুসলমান এ বিষয়ে সবাই একমত—কিন্তু পুরুষদের মধ্যে কে আগে ইমান এনেছেন এ নিয়েই সামান্য মতপার্থক্য। কারও কারও মতে হযরত আবু বকর সিদ্দীক আর কারও কারও মতে হযরত আলী সকলের আগে এনেছেন ইমান। তবে অধিকাংশের মত বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে হযরত আবু বকর সিদ্দীকই সকলের আগে ইমান এনে মুসলমান হয়েছেন; কিন্তু বালকদের মধ্যে হযরত আলীই যে সর্বাগ্রে ইমান এনেছেন ও মুসলমান হয়েছেন এ বিষয়ে সবাই নিঃসন্দেহ। বলা বাহুল্য, এত অল্প বয়সে ধর্মের ডাকে, আল্লাহ্‌র নামে সাড়া দেওয়া পৃথিবীর ইতিহাসে এক নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত।

কথিত আছে, নবুয়ত প্রাপ্তির পর রসুলে করিম যখন হযরত আলীকে ইসলাম কবুল করতে আহ্বান জানান তখন হযরত আলী সবিনয়ে আরজ করেছিলেন, 'আমি আগে আব্বার সঙ্গে একবার পরামর্শ করে দেখি।' এ বলে পিতৃগৃহের দিকে তিনি রওনা হলেন। দু-চার কদম যাওয়ার পরই হঠাৎ তাঁর খেয়াল হলো—'আব্বা তো অনেক আগেই আমাকে বলে রেখেছেন মুহম্মদ (স.) যা বলবে বিনা ওজরে তাই পালন করবে, তা মেনে নেবে বিনা দ্বিধায়। কাজেই এখন তাঁর পরামর্শ নেওয়ার দরকারই বা কী?' এ কথা মনে হতেই বালক আলী ফিরে এলেন আর সঙ্গে সঙ্গে ইমান এনে কবুল করে নিলেন ইসলাম। উদাত্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়া মুহম্মাদুন আবদুহু ও রাসুলুহু। আল্লাহ্‌ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো উপাস্য নেই আর মুহম্মদ আল্লাহ্‌র বান্দা ও রসুল।'

এবার রসুলে করিমের কাছ থেকে তিনি অজু-নামাজের সব তরিকা ও নিয়ম পদ্ধতি শিখে নিলেন। কিন্তু তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা বাপ আবু তালিবের কাছ থেকে রাখলেন গোপন। চারদিকে শত্রু। শত্রুর হামলা থেকে আত্মরক্ষার জন্য প্রথম এ স্বল্পসংখ্যক মুসলমানদের অত্যন্ত গোপনে ধর্মের হুকুম-আহকাম পালন করতে হতো। সে সূচনার দিনে বহু সাবধানে ও সতর্কতার সাথে শিশু ইসলামকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়েছিল হযরত ও হযরতের মুষ্টিমেয় সাহাবিগণকে।

নামাজের সময় হলে রসুলে করিম আলীকে সঙ্গে করে গ্রামের বাইরে কোথাও নির্জন ও নিরাপদ স্থানে চলে যেতেন—সেখানে লোকচক্ষুর অন্তরালে দুজনে নামাজ আদায় করতেন—করতেন আল্লাহ্‌র ইবাদত।

কোনো কোনো বর্ণনায় উল্লিখিত হয়েছে—হযরত রসুলে করিম যখন নামাজে দাঁড়াতেন, তখন হযরত আলী দাঁড়িয়ে থেকে পাহারা দিতেন পাছে শত্রু এসে অতর্কিতে রসুলে করিমকে আক্রমণ করে না বসে। নির্বিঘ্নে রসুলের নামাজ শেষ হলে তবে বালক আলী নিশ্চিন্ত মনে নিজে খাড়া হতেন নামাজে আর তখন আল্লাহ্‌র রসুল থাকতেন পাহারায়।

একদিন কী এক কর্ম উপলক্ষ্যে আবু তালিব মক্কার বাইরে গিয়েছিলেন। ফেরার পথে এক নির্জন স্থানে রসুলে করিম আর নিজ পুত্র আলীকে নামাজরত অবস্থায় দেখতে পেলেন। অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে নিকটে এসে তিনি বসে পড়লেন। নামাজ খতম হওয়ার পর ভ্রাতুষ্পুত্রকে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করলেন : 'তুমি যে ধর্ম প্রচার করছ তা কোন ধর্ম? তার অর্থ কী?'

রসুলে করিম ইসলামের মর্মকথা চাচাকে বিষদভাবে বুঝিয়ে দিয়ে বললেন : 'এ কোনো নতুন বা অভিনব ধর্ম নয়, পূর্ববর্তী তাবৎ নবী, আমাদের পূর্বপুরুষ হযরত ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ যে ধর্ম প্রচার করেছেন এটি অবিকল সে ধর্মই। এখন আল্লাহ্‌পাক আমাকে সে ধর্ম প্রচারেরই ভার দিয়েছেন, পাঠিয়েছেন আমাকে তাঁর বান্দাদের কাছে তাঁর কালাম পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য। চাচাজান, আপনিও এ ধর্ম কবুল করুন।' উত্তরে আবু তালিব বললেন : 'বাছা, তুমি যা বলেছ তা সবই খাঁটি ও সত্য; কিন্তু বাপ-দাদার মাজহাব ছাড়তে আমার মন কিছুতেই সায় দিচ্ছে না। আমি তোমার দ্বীনে দাখেল না হলেও আমি তোমার কাজে আপত্তি করব না, তুমি স্বচ্ছন্দে ও বিনা ওজরে তোমার ধর্ম তুমি পালন আর প্রচার করে যাও। আমার দেহে এক বিন্দু রক্ত থাকতে কেউ তোমার ক্ষতি করতে পারবে না। আমি যদ্দিন বেঁচে আছি, তদ্দিন তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। তারপর তোমার আল্লাহ্‌ই তোমাকে রক্ষা করবেন।'

এরপর পুত্র আলীর দিকে তাকিয়ে বললেন : 'তুমি তোমার ভাই মুহম্মদের সঙ্গ কখনো ছাড়বে না, সবসময় তার হুকুম মোতাবেক চলবে, তিনি তোমাকে সবসময় সৎ কর্মেরই নির্দেশ দেবেন। আল্লাহ্‌ তোমাদের উভয়ের প্রতি রহমত করুন।'

এই বলে তিনি বিদায় গ্রহণ করলেন।

হযরত আলী রসুলে করিমের স্নেহছায়ায় প্রতিপালিত হয়েছেন বলে সবসময় ছায়ার মতোই হযরতের সঙ্গে সঙ্গেই থাকতেন আর তাঁর সব কাজে হতেন শরিক। হযরতকে এত নিকট থেকে আর এত ঘনিষ্ঠভাবে দেখা ও জানার সুযোগ সম্ভবত অন্য কোনো সাহাবিরই হয়নি, আর কেউই এককভাবে রেখে যাননি এতখানি জ্ঞানগর্ভ বাণীও। মনে হয় এসবও হযরত-জীবনের শিক্ষা ও আদর্শেরই ফল। কারণ